ড. খুরশিদ আলম

অপরাধবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে রাফি হত্যা

আমার বাড়ি থেকে নুসরাতের বাড়ির দূরত্ব কয়েক কিলোমিটার। যে মাদ্রাসায় সে পড়েছে, সে মাদ্রাসার সামনে দিয়ে অন্তত তিন-চারবার হেঁটে গেছি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপদেষ্টা থাকাকালীন সোনাগাজীর বাঁধ, খাল ও রেগুলেটর পরিদর্শনে যাওয়ার সময় তার পাশ দিয়ে হেঁটে গ্রামের দিকে যাই। একদিন কৌতূহলবশত সেই মাদ্রাসার একটি শ্রেণীকক্ষে এক মিনিটের জন্য ঢুকে দেখি কিছু শিক্ষার্থী এলোমেলো হয়ে বসে আছে, কোনো শিক্ষক ছিল না। কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করে আবার নিজ গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হই।

পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে সোনাগাজীর বাঁধ মেরামত করার জন্য বিত্তহীন নারীদের নিয়ে ১০ সদস্যের দুটি নারী দল গঠন করে তা শুরু করি। দল গঠনের সময় প্রতিটিতে পাঁচজন মুসলমান এবং পাঁচজন হিন্দু মহিলা অন্তর্ভুক্ত করি। আমাদের প্রকল্প কর্মকর্তারা প্রথমে শুধু হিন্দু মহিলা দিয়ে দল গঠন করার বিষয়ে আগ্রহ দেখান, কারণ তাদের সংগঠিত করা সহজ ছিল। কিন্তু আমি আগেই ধারণা করি যে, যদি কেবল হিন্দু মহিলা নিয়ে বাঁধ মেরামতকারী দল গঠন করা হয় তাহলে তাদের ওপর যে কোনো সময় বিভিন্ন অজুহাতে হামলা হতে পারে। তাই আগেই দল গঠনের ব্যাপারে সতর্ক থাকি। প্রতিটি দলের ওপর যে কোনো সময় স্থানীয় বখাটে বা সন্ত্রাসীরা হামলা করতে পারে, বিশেষ করে তরুণী কোনো সদস্য থাকলে তাকে যৌন নিপীড়ন করতে পারে।

বাঁধ মেরামতের জন্য তাদের কাছে ধারালো রামদা, কোদাল, মুগুর ইত্যাদি দেয়া হয় বাঁধের আগাছা, গাছের ডাল ইতাদি কাটা এবং মাটি কাটা ও মেরামত করার জন্য। তা ছাড়া প্রশিক্ষণের সময় তাদের এও শিক্ষা দেয়া হয় যে, যদি কোনো সন্ত্রাসী তাদের নিপীড়ন করতে আসে তাহলে তারা যেন দলবদ্ধভাবে এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে তা প্রতিহত করে। একদিন দু'জন সন্ত্রাসী একটি দলের এক হিন্দু তরুণীকে হাত ধরে টেনে নেয়ার চেষ্টা করে। দলের সব হিন্দু-মুসলমান সদস্য রামদা, কোদাল ও মুগুর নিয়ে একসঙ্গে তাদের যখন তাড়া করে, তারা তার হাত ছেড়ে দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। দু'দিন পর যখন তাদের কাজ দেখতে যাই, তখন তারা তা দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা করে। এরপর সোনাগাজীর আর কোনো সন্ত্রাসী সেই বিত্তহীন মহিলা দলের কোনো সদস্যের সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করার সাহস পায়নি। দরিদ্র মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তি কতটা অপ্রতিরোধ্য হতে পারে এই একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়।

যাই হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে নৈতিকভাবে উন্নত করে বটে, তবে তা সব মানুষকে সবসময় পুরোপুরি নৈতিকতাসম্পন্ন করবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই ইসলামেও এসব বিষয় অমান্যকারীদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা আছে। একজন মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা পেয়ে তার বিপরীত কোনো কাজ করবে না এমনটি আশা করা ঠিক নয়। শিক্ষাগ্রহণ করার পর একটি সমাজের অধিকাংশ লোকই সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। কিন্তু যারা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে না, তাদের জন্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সমাজে অনেক কিছুই অবশ্য পালনীয় রীতি-নীতি আছে যা বেশিরভাগ মানুষ মেনে চলে। যেমন, আমাদের সমাজে এখনও বেশিরভাগ মানুষ বড়দের বা শিক্ষকের সামনে ধূমপান করেন না। তাতে বোঝা যায় যে, সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ এখনও বিরাজমান রয়েছে। সমাজের এই মূল্যবোধকে কাজে লাগানোর মতো প্রজ্ঞা সমাজপতিদের কতটা রয়েছে সে বিষয়ে যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন।

অপরাধবিজ্ঞানীরা মনে করেন, তিনটি কারণে অপরাধ ঘটতে পারে। যার একটি হচ্ছে উপযুক্ত ভিকটিম থাকা; তাকে একাকী পাওয়া বা কৌশলে একাকী করা; এবং সুযোগ মতো তার ওপর আক্রমণ করার সামর্থ্য থাকা। বাঘ যখন কোনো পালের প্রাণীকে শিকার করে তখন প্রথমে তার লক্ষ্য প্রাণীটিকে পাল থেকে আলাদা করে। সোনাগাজীর অপরাধীরা সে কাজটি সংঘবদ্ধভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছে।

অপরাধবিজ্ঞানীরা মনে করেন, একদল অপরাধী পুরোপুরি হিংস্রতা ও ক্রোধের কারণে; দ্বিতীয় দল শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য; তৃতীয় দল শিকারের প্রতি নমনীয় ও কৈফিয়তমূলক আচরণ করার কারণে এবং চতুর্থ দল যৌন-তাড়নার কারণে বিকৃত অপরাধ করতে পারে। আবার কিছু গবেষক মনে করেন, অবস্থা, সময় ও পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে তাদের অপরাধ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই অপরাধী একাধিক অপরাধ করে থাকে এবং অধিকাংশ অপরাধই থাকে পূর্বপরিকল্পিত।

কোনো অপরাধবিজ্ঞানী মনে করেন না যে, স্কুলে বা মাদ্রাসায় কোনো অপরাধ ঘটবে না। আর যদি তাই হয় তাহলে সে অপরাধ প্রতিরোধে সেখানে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা তা দেখা দরকার। হাইকোর্টের ১৪ মে ২০০৯ সালের নির্দেশনামূলক নীতিমালায় দেয়া অভিযোগ গ্রহণকারী কমিটি গঠনের নির্দেশ মাদ্রাসাটিতে কেউ পালন করেনি বলে মনে হয়েছে। এটি কার কার গাফলতিতে হয়েছে এবং এটি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ কিনা তা সরকারের দেখা দরকার।

সোনাগাজীর ঘটনাটিতে মনে হয়, সেখানে সামাজিক ক্ষমতার বড় ধরনের একটি ভারসাম্যহীনতা দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করছিল। তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এতটা আক্রমণাত্মক হতে পেরেছে। সেটি আরও ভালোভাবে লক্ষ করা যায় নুসরাতের বাবার ভূমিকা দেখে। তিনি প্রায় অসহায়ের মতো পুরো ঘটনার অনুগামী হয়েছিলেন। আমার বাবার কাছে শুনেছি, ব্রিটিশ শাসনামলে সোনাগাজীতে জালু মিয়া ডাকাত নামে একজন সামাজিক দস্যু (সোশাল বেন্ডিট বা সামাজিক দস্যু তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন বিখ্যাত ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ইরিখ হবস্‌বম) ছিল। তিনি আগে চিঠি দিয়ে জমিদার বাড়ি লুণ্ঠন করতেন এবং সে টাকা-পয়সা গরিব মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। সোনাগাজীতে এ ধরনের অভিনব সামাজিক প্রতিবাদ ছিল, নুসরাতের ক্ষেত্রে আবার নতুন আরেক অভিনব অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা গেল।

সমাজ সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাইবার সহজ পন্থা থাকা দরকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার ব্যবস্থা তেমন ছিল না। তাই নুসরাত সরল কান্নার মাধ্যমে নিকটস্থ থানায় গিয়ে তা জানায়। কিন্তু সেখানে তার অভিযোগের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে প্রকাশিত ভিডিও দেখে মনে হয়নি। এ ক্ষেত্রে দুটো ঘটনা ঘটতে পারত। এক. সে অভিমানে আত্মহত্যা করতে পারত। অথবা অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিকার চাইতে পারত। পাকিস্তানের মালালা ইউসুফ জাইয়ের মতো সে প্রচণ্ড মনোবলের অধিকারী ছিল বিধায় আমৃত্যু সোচ্চার ছিল। তাকে নিয়ে তাই অপরাধবিজ্ঞানীদের আরও গবেষণা করার সুযোগ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকা। এ বিষয়ে হাইকোর্টের যে নির্দেশনা তা যে মানা হচ্ছে না তার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন গণমাধ্যমে বহুবার প্রচারিত হয়েছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৮৪% শিক্ষার্থী এ ধরনের অভিযোগ গ্রহণের জন্য কোনো কমিটির কথা জানেন না। তবে এ বিষয়টি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ আমলে নেননি কিংবা শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তারা কোনো উদ্যোগ নেননি বলে মনে হয়েছে। প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকে বিগত বছরগুলোতে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের করণীয় কিছু ছিল কি-না সে বিষয়ে জানতে চাইলে একজন সাবেক বিচারপতি আমাকে বলেন, হাইকোর্টের আদেশের বাস্তবায়নের নিজস্ব কোনো মনিটরিং সিস্টেম নেই। কোনো ব্যক্তি যদি কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন কোর্ট সে সময় আবার আদেশ দিতে পারেন।

তৃতীয়ত, অপরাধীদের সিরিজ অপরাধ করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া। এ ধরনের অপরাধের প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকলে তখন তা সিরিজ অপরাধ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, সোনাগাজীর নুসরাতের ব্যাপারটি একমাত্র ঘটনা হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেখানে এ ধরনের নিপীড়নের ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে বলে মনে করার বিজ্ঞানসম্মত কারণ রয়েছে। সেসব মেয়ের যদি 'মি-টু' আন্দোলনের মতো নিজকে প্রকাশের স্বাধীনতা থাকত, তাহলে হয়তো আরও বহু নুসরাতের ঘটনা বের হয়ে আসত। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নুসরাতের ওপর শুধু মাদ্রাসা অধ্যক্ষ দৃষ্টি দেননি, তার সহযোগী অন্য পুরুষরাও সে রকম দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই সকল পর্যায়ের 'পুরুষরা' একটা হয়ে তার 'দেমাগ' ভাঙার চেষ্টা করেছে, সঙ্গে আবার কিছু নারীকেও নিয়েছে—সামাজিক পুঁজির (আত্মীয়তার) অসামাজিক ব্যবহার করেছে। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চরম শাস্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত অপরাধী কখনও নিঃসঙ্গ থাকে না।

চতুর্থত, সর্বশেষ চূড়ান্ত অপরাধ সংঘটিত হওয়া। এটি হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, জোরপূর্বক বিবাহ, এসিড নিক্ষেপসহ নানাবিধ অপরাধ সংঘটনে উদ্বুদ্ধ করে। এ ক্ষেত্রে হত্যা সংঘটিত হয়েছে। কোনো অপরাধবিষয়ক গবেষক যদি গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন তাহলে দেখা যাবে যে, সেই মাদ্রাসায় আরও বিভিন্ন রকমের বহু অপরাধ হয়েছে যার খুব সামান্য সবার নজরে এসেছে। নুসরাতের ক্ষেত্রে আরেকটি ঘটনা ঘটতে পারত। মাদ্রাসার ছাদে অভিযুক্তরা তাকে হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করতে পারত; কিন্তু তারা তা করেনি কারণ তাতে নুসরাত তার প্রতিবাদ বন্ধ করত না। তাই তারা তার দৃঢ়তার কাছে পর্যুদস্ত হয়ে তাকে হত্যার সিদ্ধান্তই কার্যকর করেছে।

বস্তুত, সোনাগাজীর ঘটনাটিতে মনে হয়, সেখানে সামাজিক ক্ষমতার বড় ধরনের একটি ভারসাম্যহীনতা দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করছিল। তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এতটা আক্রমণাত্মক হতে পেরেছে। সেটি আরও ভালোভাবে লক্ষ করা যায় নুসরাতের বাবার ভূমিকা দেখে। তিনি প্রায় অসহায়ের মতো পুরো ঘটনার অনুগামী হয়েছিলেন। আমার বাবার কাছে শুনেছি, ব্রিটিশ শাসনামলে সোনাগাজীতে জালু মিয়া ডাকাত নামে একজন সামাজিক দস্যু (সোশাল বেন্ডিট বা সামাজিক দস্যু তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন বিখ্যাত ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ইরিখ হবস্‌বম) ছিল। তিনি আগে চিঠি দিয়ে জমিদার বাড়ি লুণ্ঠন করতেন এবং সে টাকা-পয়সা গরিব মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। সোনাগাজীতে এ ধরনের অভিনব সামাজিক প্রতিবাদ ছিল, নুসরাতের ক্ষেত্রে আবার নতুন আরেক অভিনব অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়। আর সে অপরাধকে কিশোরদের অপরাধ বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা যে ভবিষ্যতে হবে না তা কিন্তু নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, এসবের কী কোনো প্রতিকার আছে? বস্তুত, সমাজের সবার চৈতন্য উদয়ের জন্য প্রথমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা একটি ব্যানার টাঙ্গিয়ে দেয়া যেতে পারে। সেখানে লেখা থাকতে পারে, অত্র প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণকারী কোনো কমিটি নেই। তাই আপনার কন্যাকে নিজ দায়িত্বে প্রতিষ্ঠানটিতে পাঠান। একসঙ্গে সব শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর নিয়ে উপজেলা এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে জাগ্রত করার জন্য লিখিত আবেদন প্রেরণ করা যেতে পারে। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা কর্মকর্তাকে সে দরখাস্তের অনুলিপি দেয়া যেতে পারে। এছাড়া আরও যা করা দরকার তা হল, স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। হাইকোর্টের আদেশটি বাস্তবায়ন করার জন্য শিক্ষা বিভাগের কাছে আবেদন করা। কোর্টের আদেশ বাস্তবায়নে পুনরায় কোর্টের নির্দেশের জন্য আবেদন করা। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এসব দুর্বৃত্তকে শায়েস্তা করা। উচ্চ আদালতের জনগুরুত্বপূর্ণ আদেশ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে আইন মন্ত্রণালয়ে একটি মনিটরিং সেল করা। নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে (১১.ক) মহিলা ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধের যে দায়িত্ব দেয়া আছে তা পালনে তাগিদ দেয়া। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুলিশি শক্তির আরও বেশি ইতিবাচক ব্যবহারে সৃজনশীল হওয়া এবং অপরাধ প্রতিরোধে বেশি ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হওয়া। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক কমিটি তৈরি করা।

ড. খুরশিদ আলম : *চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট*
khurshedbisr@gmail.com